بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ই এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, দোয়ার মাধ্যমে যে কীভাবে বড় বড় কাজ সাধন করা সম্ভব সেই প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার দোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করছিলেন। এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা সম্পর্কেও আলোকপাত করেন, যারা সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী হয় তারাও জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা ধারায় কিছু পরিবর্তন এনে থাকে। কিন্তু সেটি সাময়িক এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে আর তা এমনও নয় যারফলে কোন বৈপ্লবিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। পক্ষান্তরে দোয়া যদি সঠিকভাবে করা হয় তাহলে তা একটি জাতির ভাগ্য বদলে দিতে পারে। যাহোক, এর বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব সম্পর্কে আমি তিন জুমুআ পূর্বেও বলেছিলাম, কীভাবে তিনি একজন পীরের সাহচর্যে থেকে বা অবস্থান করে সংগ্রাম-সাধনা করেছিলেন আর পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও তার হৃদয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মে। তাঁর দাবীর পূর্বেই তিনি তাঁর পদমর্যাদা কী হবে তা শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। যাহোক, এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ভাষায় এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি যদ্বারা এটি বুঝা যায়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্মোহন বিদ্যা বা মেসমেরিজমের মাধ্যমে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখতেন।

মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা কী? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তা শুধুমাত্র কয়েকটি খেলা বা ক্রীড়া-কৌতুকেরই নাম কিন্তু দোয়া সেই অস্ত্রের নাম যা আকাশ এবং পৃথিবীকে বদলে দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখনও দাবী করেন নি, শুধু 'বারাহীনে আহমদীয়া' লিখেছিলেন। সূফী এবং আলেমদের মাঝে এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব এবং পীর ইফতেখার আহমদ সাহেবের পিতা সূফী আহমদ জান সাহেব সেই যুগে অসাধারণভাবে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিজ্ঞাপন পাঠের পর তিনি তাঁর সাথে পত্রালাপ আরম্ভ করেন আর এই বাসনা ব্যক্ত করেন, যদি কখনো লুধিয়ানা আসেন তাহলে আসার পূর্বেই আমাকে সংবাদ দিবেন। কাকতালীয়ভাবে সেই দিনগুলোতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লুধিয়ানা যাওয়ার সুযোগ হয়। সূফী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমন্ত্রণ জানান। নিমন্ত্রণের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার ঘর থেকে ফিরে আসার সময় সূফী আহমদ জান সাহেবও সাথে যাত্রা করেন। সূফী আহমদ জান

সাহেব রতর-সতরের পীরের মুরীদ ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও অর্থাৎ যে যুগের কথা তিনি (রা.) বলছেন এর কিছুদিন পূর্বেও রতর-সতরের সূফী ভারতের সূফীদের মাঝে অনেক বড় মর্যাদা রাখত এবং পুরো এলাকায় প্রসিদ্ধ ছিল। তপস্যা এবং তাক্বওয়া ছাড়াও মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যায় সেই পীর সাহেব এতটাই দক্ষ ছিলেন, তিনি যখন নামায পড়তেন তখন তার ডানে-বামে অনেক মুরীদ বা ভক্ত সারিবদ্ধভাবে বসে থাকতো। আর নামাযের পর তিনি যখন সালাম ফিরাতেন তখন সালামের সাথে তিনি ডানে-বামে ফুঁকও দিতেন এবং এর প্রভাবও ছিল কেননা মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যার প্রবল প্রভাব ছিল একইসাথে রোগীরা আরোগ্যও লাভ করত। যেভাবে গত খুতবায় আমি এর বরাতে কথা বলেছিলাম, পীর সাহেব অর্থাৎ সূফী আহমদ জান সাহেব বারো বছর পর্যন্ত তার শিষ্যত্বে কাটিয়েছেন আর সেই পীর সাহেব তার দ্বারা চাক্কি বা যাতা পেষাতেন। যাহোক, রাস্তায় সূফী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন, আমি এত বছর রতর-সতরের পীরের খিদমত করেছি। এরপর সেখান থেকে আমার এত শক্তি লাভ হয়েছে যে, দেখুন! আমার পিছনে যে ব্যক্তি আসছে, যদি আমি মনোসংযোগ করে তার ওপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে সে এখনই মাটিতে পড়ে ছটফট করবে। অর্থাৎ সম্মোহন শক্তির মাধ্যমে এমন হবে। একথা শুনতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে যান এবং তাঁর ছড়ির প্রান্ত দ্বারা মাটিতে রেখা অঙ্কন করতে করতে বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল তাঁর ভেতর যখন কোন বিশেষ আবেগ বা উত্তেজনা বিরাজ করত তখন তিনি ধীরে ধীরে নিজের ছড়ির প্রান্ত সেভাবে মাটিতে ঘষতেন যেভাবে মাটি খুঁড়ে কোন কিছু বের করা হয়। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে যান আর নিজের ছড়ির ডগা দ্বারা ধীরে ধীরে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করেন এবং বলেন, সূফী সাহেব! এই ব্যক্তি ভূপাতিত হলে আপনারই বা কী লাভ হবে আর তারই বা কী লাভ হবে? সূফী সাহেব যেহেতু সত্যিকার অর্থেই খোদাপ্রেমিক মানুষ ছিলেন আর খোদা তা'লা তাকে দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিলেন তাই এ কথা শুনতেই তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে যান এবং বলেন, আমি আজ থেকে এই জ্ঞান চর্চা করা হতে তওবা করছি বা বিরত হচ্ছি। আমি বুঝতে পেরেছি, এটি জাগতিক বিষয়, ধর্মীয় কোন বিষয় নয়। অতএব এরপর তিনি এ তথ্য সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, এই জ্ঞান কেবল ইসলামেরই বিশেষত্ব নয়। কোন হিন্দু এবং খ্রিষ্টানও যদি এ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে চায় তাহলে তা করতে পারে। তাই আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে আমার কোন ভক্ত বা শিষ্য একে ইসলামের অঙ্গ বা অংশ মনে করে যেন এর চর্চা না করে। হ্যাঁ জাগতিক জ্ঞান হিসেবে যদি চর্চা করতে চায় তাহলে করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই যে আমি বললাম, খোদা তা'লা তাকে দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিলেন আমাদের কাছে এর এক আশ্চর্যজনক প্রমাণ রয়েছে আর তাহলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন পর্যন্ত কেবলমাত্র 'বারাহীনে আহমদীয়া'ই প্রণয়ন করেছিলন আর তিনি

অর্থাৎ সূফী সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, এই ব্যক্তি মসীহ্ মওউদ হতে যাচ্ছেন অথচ তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছেও এটি স্পষ্ট হয়নি যে, তিনি কোন দাবী করতে যাচ্ছেন। সে যুগেই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে এক পত্রে এই পঙতি লিখেছেন আর যে পঙতির কথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তিনি লিখেছেন, **"হাম মারিযো কি হ্যায় তুম হি পে নিগাহ্, তুম মসীহা বানো খোদাকে লিয়ে"** অর্থ- আমরা যুগের ব্যধিগ্রস্ত লোকদের তোমার সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ, তুমি খোদার খাতিরে যুগের চিকিৎসক হিসেবে আবির্ভূত হও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি থেকে বুঝা যায়, তিনি দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা রাখতেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে অবহিত করেছিলেন, এ ব্যক্তি মসীহ্ মওউদ হতে যাচ্ছেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন কিন্তু তিনি নিজ সন্তান-সন্ততিকে এই তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে যান, হযরত মির্যা সাহেব দাবী করবেন, তাঁকে মানতে গিয়ে কালক্ষেপণ করবে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, তার আরো একটি পরিচয় হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র বিয়েও তার ঘরেই হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তার জামাতা ছিলেন।

এরপর মেসমেরিজম বা সম্মোহন বিদ্যা সংক্রান্ত একটি ঘটনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে ঘটেছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের ওপর যে মেসমেরিজম করেছে তাকে শুধু ব্যর্থই করেন নি বরং নিদর্শন দেখিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মেসমেরিজম বিদ্যায় পারদর্শীদের সংকল্প শক্তি ঈমানী শক্তির মোকাবিলায় কী-ই বা গুরুত্ব রাখে? সম্মোহন বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের সংকল্প শক্তি ঈমানের শক্তির মোকাবেলায় দাঁড়াতেই পারে না। খোদা প্রদত্ত সংকল্প শক্তি এবং মানুষের সংকল্প শক্তির মাঝে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে। যেই মসজিদে তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন সেটি মসজিদে আক্বসা বা মোবারক হবে। খলীফা সানী (রা.) বলেন, এই মসজিদেরই নিচের ছাদে (হুযূর বলছেন, খুব সম্ভব মসজিদে মোবারকই হবে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মজলিসে বা বৈঠকে বসতেন। একবার তিনি (আ.) মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন এক হিন্দু যে কিনা লাহোরের কোন এক বিভাগে হিসাব রক্ষক ছিল, (হুযূর বলছেন), এটি নিশ্চিতভাবে মসজিদে মোবারকেরই ঘটনা, এবং মেসমেরিজমে অনেক দক্ষ ছিল। সে কোন বরযাত্রীদের সাথে এই উদ্দেশ্য নিয়ে কাদিয়ান আসে যে, আমি মির্যা সাহেবের ওপর সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করব আর তিনি মজলিসে বা বৈঠকে বসে নাচতে বা নৃত্য করতে আরম্ভ করবেন (নাউযুবিল্লাহ্) আর এভাবে মানুষের মাঝে তিনি হেয় প্রমাণিত হবেন। এই ঘটনা সেই হিন্দু স্বয়ং এক আহমদী বন্ধুকে শুনিয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরের সেই আহমদীর হাতে তাঁর একটি বই পাঠান এবং বলেন, এই গ্রন্থ অমুক হিন্দুর হাতে হস্তান্তর করবে। সেই আহমদী বন্ধু সে বইটি সেই হিন্দুর হাতে হস্তান্তর করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, হযরত

সাহেব আপনাকে তাঁর বই কেন পাঠালেন আর তাঁর সাথে আপনার সম্পর্কই বা কী? তখন সেই হিন্দু তার পুরো ঘটনা শোনায়। সে বলে, সম্মোহন বিদ্যায় আমি এত দক্ষতা রাখি যে, আমি যদি টমটম বা ঘোড়ার গড়িতে বসে কোন ব্যক্তির ওপর মনোসংযোগ করি তাহলে সেও টমটম গাড়ির পিছনে ছুটে আসবে অথচ তার সাথে আমার পরিচয় বা জানাশোনাও থাকবে না। সে বলে, আমি আর্য এবং হিন্দুদের কাছে মির্যা সাহেবের কথা শুনেছি যে, তিনি আর্য ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক বই-পুস্তক লিখেছেন। আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, মেসমেরিজম এর মাধ্যমে মির্যা সাহেবের ওপর প্রভাব বিস্তার করব। আর তিনি যখন বৈঠকে বা মজলিসে উপবিষ্ট থাকবেন তখন তাঁর ওপর মনোসংযোগ করে তাঁর মুরীদ বা ভক্তদের সামনে তাঁকে হেয় প্রমাণ করব। এই উদ্দেশ্যে একটি বিয়ে উপলক্ষে আমি কাদিয়ান যাই। মজলিস বা বৈঠক চলছিল আর আমি দরজায় বসে মির্যা সাহেবের ওপর মনোসংযোগ আরম্ভ করি। তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নসীহত মূলক কিছু কথা বলছিলেন। সেই ব্যক্তি বলে, আমি মনোসংযোগ করি কিন্তু তাঁর ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। আমি ভাবলাম তাঁর সংকল্প শক্তি কিছুটা দৃঢ় তাই আমি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোসংযোগ করা আরম্ভ করি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ওপর কোন প্রভাব পড়েনি আর তিনি একইভাবে তাঁর আলাপচারিতায় রত থাকেন। আমি ভাবলাম, তাঁর সংকল্প শক্তি আরো বেশি দৃঢ় তাই আমি আমার যা কিছু জানা ছিল তার পুরোটা কাজে লাগাই আর নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করি। কিন্তু আমি যখন সর্বশক্তি নিয়োজিত করি তখন আমি দেখি, একটি সিংহ আমার সামনে বসে আছে আর আমার ওপর আক্রমনে উদ্যত। এক জায়গায় এটিও বর্ণনা করা হয়েছে, প্রত্যেক বারই সিংহ দেখা যেত কিন্তু শেষবার সেই সিংহকে আক্রমনের জন্য উদ্যত দেখা গেলো। যাহোক সে বলে, সিংহ দেখে ভয়ে আমি আমার জুতা নিয়ে সেখান থেকে ছুটতে থাকি। আমি যখন দরজার কাছে পৌঁছি তখন মির্যা সাহেব তাঁর শিষ্যদের বলেন, দেখ তো এ ব্যক্তি কে। তখন এক ব্যক্তি আমার পিছনে সিঁড়ি বেয়ে নীচে আসে এবং মসজিদের পাশের চত্বরে সে আমাকে ধরে ফেলে। আমি যেহেতু তখন কান্ডজ্ঞানশূন্য ছিলাম তাই আমি সেই ব্যক্তিকে বললাম, এখন আমাকে যেতে দাও কেননা আমার কান্ডজ্ঞান সঠিকভাবে কাজ করছে না। আমি পরে পুরো ঘটনা মির্যা সাহেবকে লিখে পাঠাব। তাকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে সে এই পুরো ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লিখে পাঠায় এবং বলে, আমি অপরাধ করেছি। আমি আপনার পদমর্যাদা শনাক্ত করতে পারি নি বা বুঝতে পারি নি তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, লাহোরের মিঞাঁ আব্দুল আযীয মোগল সাহেব শোনাতেন, তার বংশের অনেকে এখানেও আছে। তিনি বলতেন, আমি সেই হিন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এটি কেন ভাবলে না যে, মির্যা সাহেব মেসমেরিজম বা সম্মোহোন বিদ্যা জানেন আর এ বিদ্যায় তোমার চেয়ে বেশি দক্ষ। সে বলে, এটি অসম্ভব, কেননা এর জন্য মনোযোগ বা মনোসংযোগ আবশ্যক আর এর জন্য পূর্ণ নিরবতা-নিথরতার প্রয়োজন, কিন্তু মির্যা

সাহেব যেহেতু আলাপচারিতায় রত ছিলেন তাই আমি বুঝতে পেরেছি, তার সংকল্প শক্তি জাগতিক নয় বরং ঊর্ধ্বলোকের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অতএব যে সংকল্প শক্তি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া হয় এবং যা পূর্ণ ঈমানের ফলে সৃষ্টি হয় তার মাঝে এবং মানুষের সংকল্প শক্তির মাঝে দু'মেরুর পার্থক্য রয়েছে। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা সংকল্প শক্তি দান করেন তার সামনে মানবীয় সংকল্প শক্তি তো বালকের খেলা-তুল্য। যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর ছড়ির মোকাবিলায় জাদুকরদের সাপ ব্যর্থ হয়েছিল অনুরূপভাবে খোদার প্রিয়দের সংকল্প শক্তি যখন প্রকাশ পায় তখন এ ধরনের সংকল্প শক্তির অধিকারী অর্থাৎ জাগতিক সংকল্প শক্তি যারা রাখে তারা তুচ্ছ প্রমাণিত হয়।

এরপর জাতিগত উন্নতির জন্য কী কী প্রয়োজন এবং ধর্মীয় বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমান কোন পর্যায়ে ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য তাঁর আত্মাভিমান কেমন ছিল, একবার এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

জাতিগত উন্নতির জন্য সকল সত্য বা পুরো সত্যকে আত্মস্থ করা বা ধারণ করা আবশ্যক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মসলা-মাসায়েল এবং বিশ্বাস সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এমন নয়, শুধু ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখবো আর এটি বলবো যে, আমাদের জন্য এটিই যথেষ্ট। বরং ওফাতে মসীহ্ বা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়কে সামনে রেখে ভাবা উচিত, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাস করা কেন আবশ্যক? হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত বিশ্বাসের যেই বিষয়টি আমাদের পীড়া দেয় তাহলো, প্রধানত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসের ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম মর্যাদার কোন নবী পূর্বেও আসেনি আর পরেও আসবে না। আর ঈসা (আ.)-কে জীবিত মানলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ঈসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় অথচ তিনি (সা.)-ই সারা বিশ্বের সত্যিকার অর্থে সংশোধন করেছেন— আর এই বিশ্বাস ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। আমরা তো এক মুহূর্তের জন্যও এমন ধারণা নিজেদের হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না যে, ঈসা (আ.) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ ছিলেন আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাটির নিচে কবরস্থ আছেন আর হযরত ঈসা (আ.) চতুর্থ আকাশে বসে আছেন, এই বিশ্বাস পোষণ করলে ইসলামের চরম অসম্মান বা অবমাননা হয়।

ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকায় বিশ্বাস করলে দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের পীড়া দেয় তাহলো, এরফলে আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদ বা একত্ববাদেও ওপর আঘাত আসে। এই দু'টো কারণেই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের জোর দিতে হয়। যদি এই বিষয়গুলো না থাকতো তাহলে ঈসা (আ.) আকাশে থাকুন বা মাটিতে তাতে আমাদের কিছুই যেতো আসতো না। কিন্তু যেহেতু তার আকাশে আরোহন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের অসম্মানের কারণ এবং

তৌহীদের পরিপন্থী তাই আমরা এই বিশ্বাসকে কীভাবে সহ্য করতে পারি? এই বিশ্বাসকে মানার তো প্রশ্নই উঠে না বরং আমরা একথা শোনাও পছন্দ করবো না, ঈসা (আ.) হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা সচরাচর দেখি, সাধারণ আহমদীরা যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক করে আর নিজের যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করে তখন তাদের মাঝে কোন আবেগ বা উচ্ছাস পরিলক্ষিত হয় না বরং তারা বিষয়টি এমনভাবে বর্ণনা করে যেভাবে সাধারণ কথাবার্তা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি, তিনি যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি উঠাতেন তখন তিনি আবেগ বা উত্তেজনার বশে কাঁপতে থাকতেন আর তাঁর কণ্ঠস্বর এত প্রতাপান্বিত হতো, মনে হতো তিনি যেন ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত বিশ্বাসকে টুকরো টুকরো করছেন। তাঁর অবস্থা তখন সম্পূর্ণরূপে বদলে যেত। আর তিনি সুগভীর আবেগ এবং উত্তেজনার সাথে একথা উপস্থাপন করতেন, পৃথিবীর উন্নতির পথে একটি অনেক বড় পাথর বা অন্তরায় বাঁধ সাধছিল যা আমি উঠিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলছি। পৃথিবী অন্ধকারের গহ্বরে নিপতিত হচ্ছিল কিন্তু আমি তাকে আলোর ময়দানের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি (আ.) যখন এই বক্তৃতায় রত থাকতেন তখন তাঁর কণ্ঠে একটি বিশেষ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হতো আর এমন মনে হতো, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিংহাসনে ঈসা আসীন হয়েছেন যিনি তাঁর সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছেন আর তিনি (আ.) তার অর্থাৎ ঈসার কাছ থেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিংহাসন ফিরিয়ে নিতে চান। এ-তো ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমান। কিন্তু বর্তমান আলেমদের জন্য আক্ষেপ! মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য এত গভীর আত্মাভিমান এবং প্রেরণা যে ব্যক্তি লালন করতেন তার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি নাকি নাঊযুবিল্লাহ্ নিজেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে বড় মনে করতেন বা আহমদীয়াতকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতেন।

আরো একটি ঘটনা হলো, আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে কোন উচ্চপদে আসীন করেন {এটি ঘটনা নয় বরং মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এটি বর্ণনা করেছেন} তখন তাকে কীভাবে পথের দিশা দেন আর কীভাবে মানুসের আভ্যন্তরীণ চিত্র তাদের সামনে প্রকাশ করেন সেই সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষ যখন সুউচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয় অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'লা দাঁড় করান সে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আপনা-আপনিই দিক নির্দেশনা লাভ করে আর এমন প্রচ্ছন্ন দিক নির্দেশনা সে লাভ করে যাকে ইলহামও বলা যায় না আবার সেটি সম্পর্কে আমরা একথাও বলতে পারি না যে, তা ইলহাম থেকে ভিন্ন কিছু। ইলহাম আমরা এজন্য বলতে পারি না, সেটি আক্ষরিক অর্থে ইলহাম হয় না আর ইলহাম নয় একথাও আমরা এ কারণে বলতে পারি না কেননা; তা কার্যতঃ ইলহাম হয়ে থাকে আর মানব হৃদয়ে খোদার জ্যোতি অবতীর্ণ হয়ে এটি সুস্পষ্ট করে, বিষয়টি এমন অথচ শাব্দিকভাবে এটি এত স্পষ্ট করে বলা হয় না। তিনি বলেন, অনেক সময় যখন এর চেয়েও স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোন কথা জানানো হয় তখন

সেটিকে কাশ্‌ফ বা দিব্য দর্শন বলা হয়। যখন স্পষ্টভাবে (জাগ্রত অবস্থায়) হয় তখন কাশ্‌ফও হয়ে থাকে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, অনেক মানুষ যখন আমার সামনে আসে তখন তাদের ভেতর থেকে আমি এমন কিরণ বের হতে দেখি যা থেকে আমি বুঝতে পারি, তাদের ভেতর এই এই ত্রুটি আছে বা অমুক গুণাবলী রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সেই ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করার অনুমতি থাকে না। আল্লাহ্ তা'লার এটিই রীতি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের ফিতরত বা আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিজেই তুলে না ধরে– তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন না। তাই এই রীতির অধীনে নবীগণ এবং তাঁদের প্রতিচ্ছবি লোকদের রীতি হলো, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা কারো সামনে উল্লেখ করেন না যতক্ষণ সেই ব্যক্তি নিজের রোগ-ব্যাধি নিজেই প্রকাশ না করে দেয়।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়দের সত্যতা প্রমাণের জন্য কীভাবে অন্যদেরকেও নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা যা এক অ-আহমদীর সাথে ঘটেছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কোন মানুষের দেহ থেকে এমন কিরণ কীভাবে নির্গত হতে পারে যা অন্যদেরও দৃষ্টিগোচর হয়– এই ধারণা শুধুমাত্র এই কারণে মানুষের মনে দানা বাঁধে কেননা, মানুষ এই নিদর্শনকে বাহ্যিক অর্থে নিয়ে থাকে। যদি তারা বুঝত, এটি একটি দিব্য দর্শনের অভিজ্ঞতা তাহলে এমন ভুল ধারণা বা কুমন্ত্রনাও তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হতো না। মূসার যুগ তো অনেক দূরের কথা আমরা দেখি যে এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এমন কতক নিদর্শন দেখিয়েছেন যাতে দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আল্লাহ্ তা'লার ঐশী জ্যোতিকে বাহ্যিক রূপেও প্রতিফলিত হতে দেখেছেন এবং এর আধ্যাত্মিক স্বাদও তারা উপভোগ করেছেন। যেমন ১৯০৪ সনে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোর যান তখন সেখানে এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। এক অ-আহমদী উকিল বন্ধু শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বক্তৃতা চলাকালে আমি দেখেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাথা থেকে নূরের একটি স্তম্ভ নির্গত হয়ে আকাশের দিকে যাচ্ছে। তখন আমার সাথে আরো এক বন্ধু বসে ছিলেন। আমি তাকে বললাম, দেখ তো এটি কী? দ্বিতীয় বন্ধুও সেটি দেখে তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, এটি তো আলোর এক স্তম্ভ যা হযরত মির্যা সাহেবের মাথা থেকে বের হয়ে আকাশ পর্যন্ত প্রলম্বিত রয়েছে। শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের ওপর এই দৃশ্যের এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি সেদিনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন।

এগুলো এমন সব নির্দশন যা দেখে মানুষ ঈমান লাভ করেছে আর শুধু তাই নয় বরং নিদর্শনের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতি রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা এখনো মানুষের সামনে প্রকাশ করে চলেছেন যেমন গত এক জুমুআর পূর্বের খুতবায় সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাও আমি বর্ণনা করেছিলাম।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক বৈঠকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে এক বন্ধু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে লিখেছেন,

আমার বোনের কাছে জ্বীন আসে। আমাদের দেশেও আর আরবদের মাঝেও এই ধারণা প্রচলিত রয়েছে, মানুষের ওপর জ্বীন ভর করে। আর জ্বীন তাড়ানোর জন্য যার ওপর বা যে বেচারার ওপর জ্বীন ভর করে তার ওপর অনেক অত্যাচার করা হয়। অনেক বেচারার অর্থাৎ যার ওপর জ্বীন ভর কওে জ্বীন বের করার জন্য অনেক সময় তাদের মেরেও ফেলা হয়। যাহোক, কেউ একজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করে, আমার বোনের কাছে জ্বীন আসে আর সেই জ্বীনেরা এমন, তারা বলে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে পত্র লিখেন, আপনি সেই জ্বীনদের এই বার্তা পৌঁছে দিন, একজন মহিলাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ বা বিরক্ত করছ? যদি কষ্ট দিতেই হয় বা বিরক্ত করতেই হয় তাহলে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী বা মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবকে গিয়ে কষ্ট দাও বা বিরক্ত কর। এক হতভাগিনী নারীকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এমন কোন জ্বীন নেই যা সাধারণ মানুষ মনে করে থাকে। নিঃসন্দেহে এমন কিছু মানুষও থেকে থাকবে যারা নিজেদের ইংরেজী শিক্ষা-দিক্ষার কল্যাণে পূর্বেই এই বিশ্বাস পোষণ করে, জ্বীন বলতে কিছু নেই। কিন্তু মু'মিনের কাছে আসল প্রশ্ন এটি নয়, তার বিবেক বা কমনসেন্স কী বলে বরং আসল প্রশ্ন হলো, কুরআন কী বলে? মু'মিনকে এভাবে ভাবা উচিত। যদি কুরআন বলে, সাধারণ মানুষ যেমন জ্বীনের ধারণা রাখে তেমন জ্বীনই রয়েছে– তাহলে আমরা মানলাম এবং সত্যায়ণ করলাম। আর যদি কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের বাইরে জ্বীন বলতে কোন সৃষ্টি নেই তাহলে আমাদেরকে এই কথা মানতে হবে। যাহোক, মু'মিনকে সর্বাবস্থায় কুরআনের কথাই শিরোধার্য করতে হবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার প্রিয়দের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য পাগল এবং উন্মাদদের ওপরও কীভাবে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এতদসংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যা আমরা পূর্বেও কয়েকবার শুনেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই শোনাতেন, একবার তিনি লাহোর যান। কিছু বন্ধু নিবেদন করে বলেন, সাদরায় এক পাগল থাকে, তার কাছে যাওয়া উচিত। কিন্তু অপর কয়েকজন বন্ধু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, সে অনেক নোংরা গালি দেয় তাই তার কাছে যাওয়া সমীচীন হবে না। কিন্তু যারা যাওয়ার পক্ষে ছিল তারা বলে, তাঁর (আ.) ওপর ইলহাম হয়, শোনা উচিত যে, সে কী বলে। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামকে যাচাই করার জন্য একটিই মাপকাঠি তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যে, এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও যেতে অস্বীকার করেন কিন্তু মানুষ জোরাজুরি করে তাকে নিয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই তখন সেই ব্যক্তি গালি দিতে দিতে হঠাৎ নির্বাক হয়ে যায়। তার কাছে একটি বাঙ্গি বা তরমুজ রাখা ছিল। সে তা হাতে নিয়ে আমার কাছে উপস্থাপন করে আর বলে, এটি আপনার জন্য উৎসর্গ করছি। যারা কেবল বাহ্যিক কথাবার্তার প্রতি দৃষ্টি দেয়, এমনটি দেখে তাদের হৃদয়ে তার প্রতি আরো ভক্তি

জন্মে কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, সে এক পাগল। অতএব অনেক সময় পাগলরাও এমন অনেক বিষয়ে দেখে থাকে যা বুদ্ধিমানদের জন্য দেখা সম্ভব হয় না। যেহেতু এই জগতের সাথে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে তাই অনেক সময় অদৃশ্যের কিছু বিষয় তাদের চোখেও ধরা পড়ে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিদর্শনাবলী এবং মো'জেযা হতে কতক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন; এর কয়েকটি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। বাউলো বা পাগলা কুকুরে কামড়ানো এবং সেই রোগীর আরোগ্য লাভ সংক্রান্ত একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেটি এভাবে বর্ণনা করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের সকল ঘটনা যেহেতু সংরক্ষিত নয় তাই এই ধরনের খুব বেশি দৃষ্টান্ত এখন পাওয়া যায় না। নতুবা আমি মনে করি এমন শত শত বরং হাজার হাজার দৃষ্টান্ত তাঁর (সা.) জীবনে রয়েছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যখন কি-না নাস্তিকতার প্রবল স্রোত বইছিল আর তা খন্ডনের জন্য ঐশী নিদর্শনের অসাধারণ প্রয়োজন তাই আল্লাহ্ তা'লা এ ধরনের বহু নিদর্শন দেখিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনের কথা কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি আব্দুল করীম সাহেব নামের এক ব্যক্তির ঘটনা শোনাচ্ছি যিনি কাদিয়ানের স্কুলে পড়াশুনা করতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে পাগলা কুকুর কামড় দেয় যার ফলে তাকে চিকিৎসার জন্য কাসৌলি পাঠানো হয়। বাহ্যতঃ তার চিকিৎসা সফল হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের কিছুদিনের মাথায় পুনরায় রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। তখন কোন ব্যবস্থাপত্র চেয়ে কাসৌলি টেলিগ্রাম পাঠানো হলে উত্তর আসে, Nothing Can Be Done For Abdul Karim অর্থাৎ দুঃখের বিষয়, এখন আর আব্দুল করীমের জন্য আর কিছুই করার নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তার রোগের বিষয়টি অবহিত করা হয়। যেহেতু তখন জামাতের কেবল সূচনা ছিল এবং প্রাথমিক যুগ ছিল আর এই ব্যক্তি দূর-দুরান্তের অঞ্চল হায়দ্রাবাদ দক্ষিণের একটি গ্রাম থেকে শিক্ষার জন্য এসেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে গভীর সহানুভূতি জাগে এবং তিনি তার আরোগ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন আর বলেন, ইনি এত দূর থেকে এসেছেন। তার এভাবে মৃত্যু হবে! এ কথায় হৃদয় সায় দেয় না। এক জায়াগায় তিনি এও বলেছেন, তার মা গভীর আগ্রহ এবং প্রেরণা নিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য এমন এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাকে পাঠিয়েছেন। এই কারণেও আমার হৃদয়ে তার পক্ষে দোয়ার প্রেরণা সঞ্চার হলো। যাহোক, এই দোয়ার ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তাহলো, রোগের আক্রমনের পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন অথচ মানুষের সৃষ্টি হতে অদ্যবধি এমন রোগী কখনও আরোগ্য লাভ করেনি। (তখনকার চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস অন্তঃতপক্ষে একথাই বলে)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার এক ডাক্তার আত্মীয় আছেন। তিনি এখনো ডাক্তারী করেন। তিনি তার ছাত্র জীবনের ঘটনা শুনিয়েছেন, একবার আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্য এক ছাত্রের সাথে তিনি আলাপ করছিলেন। আলোচনা কালে তিনি এই ঘটনাটি স্বাক্ষ্য

হিসেবে উপস্থাপন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আছেন, তিনি এভাবে দোয়া শোনেন এবং এভাবে এই রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। সেই ছাত্র যার সাথে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো না সে বলে, এমন রোগীর বাঁচা সম্ভব। এটি এমন অসম্ভব কোন বিষয় নয়। তিনি বলেন, দৈবক্রমে সেদিন কলেজে প্রফেসরের লেকচার ছিল "কুকুরে কামড়ানো রোগীর অবস্থা" সম্পর্কে। প্রফেসর যখন লেকচারের জন্য দন্ডায়মান হন এবং এই কথার ওপর জোর দেওয়া আরম্ভ করেন, এই রোগ বা জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা রোগের আক্রমনের পূর্বেই করা উচিত আর কালক্ষেপণ না করে অচিরেই সেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি এ কথা সুস্পষ্ট করানোর জন্য বললাম, জনাব! অনেকে বলে, এই রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ার পরও রোগী আরোগ্য লাভ করতে পারে। তখন অধ্যাপক তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, এটি কখনো সম্ভব নয়। যে এমন কথা বলে সে নির্বোধ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক কথায় এটি এমন এক রোগ ছিল যার কোন চিকিৎসা হওয়া ছিল অসম্ভব আর কখনো হয়ও নি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা মিঞাঁ আব্দুল করীমকে আরোগ্য দান করেন আর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখনও জীবিত আছেন অর্থাৎ, সেই সময় যখন তিনি (রা.) এটি বর্ণনা করছিলেন। অতএব প্রমাণিত হলো, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্ধ্বেও এক সিদ্ধান্তকারী সত্তা রয়েছেন যার হাতে রয়েছে আরোগ্য।

তিনি (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমেরিকা থেকে দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা আসে। তাদের মধ্য হতে একজন পুরুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তাঁর দাবী সম্পর্কে কথা উত্থাপন করে। আলোচনাকালে হযরত মসীহ্ নাসেরী বা ঈসা (আ.)-এর কথাও উল্লেখ করা হয়। সেই ব্যক্তি বলে, তিনি তো খোদা ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তার খোদা হওয়ার তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে? সে বলে, তিনি নিদর্শনাবলী বা মো'জেযা দেখিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, নিদর্শনাবলী তো আমরাও প্রদর্শন করি। সে ব্যক্তি বলল, আমাকে কোন মো'জেযা বা নিদর্শন দেখান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তর দেন, তুমি স্বয়ং আমার মো'জেযা বা নিদর্শন। অর্থাৎ, যে আমেরিকান প্রশ্ন করেছে তাকে বলেন, তুমি স্বয়ং আমার নিদর্শন বা মো'জেযা। এটি শুনে সে হতভম্ব হয়ে যায় আর বলে, আমি কীভাবে মো'জেযা বা নিদর্শন হতে পারি? তিনি (আ.) বলেন, কাদিয়ান অতি ক্ষুদ্র এবং অপরিচিত একটি গ্রাম ছিল। সামান্য খাদ্যসামগ্রীও এখানে পাওয়া যেত না, এমনকি এক রূপীর আটাও পাওয়া যেত না। আর কারো প্রয়োজন হলে সে গম কিনে ভাঙ্গিয়ে নিত। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন, **"আমি তোমার নামকে পৃথিবীতে সমুন্নত করব আর সারা পৃথিবীতে তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। চতুর্দিক থেকে মানুষ তোমার কাছে আসবে এবং তাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণও এখানেই চলে আসবে"**। **"ইয়া'তূনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক্ব"** অর্থাৎ, সকল জাতি এবং সকল দেশের মানুষ তোমার কাছে আসবে। **"ইয়া'তীকা মিন কুল্লি**

ফাজ্জিন আমীক্ব” অর্থাৎ এত বেশি মানুষ আসবে, তারা যেসব পথ ধরে আসবে সেগুলো গর্তবহুল এবং গভীর হয়ে যাবে। এখন দেখ! পথ কতটা গর্তবহুল হয়ে গেছে। বাটালা থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত যে রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তায় গত বছরই সরকার দু'হাজার রূপীর মাটি ফেলেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, তুমি আমেরিকা থেকে আমার কাছে এসেছ। আমার সাথে তোমার কিসের সম্পক? দাবী করার আগে আমাকে কে জানত? কিন্তু আজ তুমি এত দূর থেকে আমার কাছে হেঁটে এসেছ এটিই আমার সত্যতার নিদর্শন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার ভালভাবে স্মরণ আছে, যখন এই আলোচনা হচ্ছিল আর সেই ব্যক্তি বলেছিল, আপনি আমাকে আপনার কোন মো'জেযা বা নিদর্শন দেখান তখন সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল, এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কী উত্তর দিবেন? সবাই ভেবেছিল, তিনি (আ.) হয়তো এমন কোন বক্তৃতা করবেন যাতে মো'জিযা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিবেন, কীভাবে তা প্রকাশ পায়। কিন্তু যখনই সেই ব্যক্তি তার কথা শেষ করে এবং তাঁকে (আ.) ইংরেজী থেকে উর্দূতে অনুবাদ করে শোনানো হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি একটি সামান্য কথা ছিল কিন্তু সবার পক্ষে এটি বোঝা সম্ভব নয়। এখনও প্রত্যেক এমন মানুষ যে বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না সে বলবে, এটি কিসের নিদর্শন? কিন্তু যাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত এবং যারা বিবেক-বুদ্ধি রাখে তারা বুঝতে পারবে, এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন আর সত্য গ্রহণকারীর জন্য এটিই যথেষ্ট।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, আমার সত্যতার স্বপক্ষে লক্ষ লক্ষ নিদর্শন দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি বলব, এত বেশি নিদর্শন দেখানো হয়েছে যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক নির্বোধ এমন আছে যারা বলে, এত সংখ্যক তো মির্যা সাহেবের ইলহামও নেই তাহলে নিদর্শনাবলী কীভাবে এত বেশি হতে পারে? কিন্তু যারা বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তারা খুব ভালভাবেই জানে, লক্ষ লক্ষ নিদর্শন তো একটি মাত্র ইলহাম থেকেও প্রকাশ পেতে পারে।

একটা প্রসিদ্ধ কাহিনী রয়েছে, এক ব্যক্তি ছিল। সে তার ভাতিজাদের বলল, আগামীকাল আমি তোমাদের এমন একটি লাড্ডু খাওয়াব যা বেশ কয়েক সহস্র বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ বানিয়েছে। দ্বিতীয় দিন তারা যখন খাবার খেতে বসল তখন তারা লাড্ডু খাওয়ার প্রত্যাশায় আর কিছু না খেয়ে চাচাকে বলে, সেই লাড্ডু দিন। সেই ব্যক্তি একটি সামান্য লাড্ডু বের করে তাদের সামনে রাখে এবং বলে, এটিই সেই লাড্ডু যার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। এটি দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়, এটি কী করে লক্ষ লক্ষ মানুষের বানানো লাড্ডু হতে পারে? চাচা বলেন, তোমরা কাগজ কলম নিয়ে লেখা আরম্ভ কর আমি তোমাদের খুলে বলছি, সত্যিই এই লাড্ডু বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ মিলে বানিয়েছে। দেখ! একজন ময়রা এটি বানিয়েছে। এটি বানানোর জন্য যে সমস্ত জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে তা সেই ময়রা বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। আর এর প্রতিটি বস্তু তৈরির পিছনেও সহস্র সহস্র মানুষের হাত রয়েছে যেমন চিনির কথাই ভাব! তা

প্রস্তুতের জন্য কত মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়েছে। কতক তা মাড়াই করেছে, কতক রস বের করেছে, কেউ ক্ষেত থেকে এনেছে, কেউ হাল চালিয়েছে, কেউ পানি সিঞ্চন করেছে। আবার হালের জন্য যে লোহা এবং কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে এর প্রস্তুতকারীরা রয়েছে। এভাবে যদি সবার হিসাব কর তাহলে মানুষের সংখ্যা কত দাঁড়াবে? এরপর চিনি ছাড়া এতে আটাও রয়েছে। আটা প্রস্তুতকারীর কথা চিন্তা কর। এভাবে কী সংখ্যা এত দাঁড়ায় না? ভাতিজারা একথা শুনে বলে, হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। এই কথাটি সেই বালকরা বুঝতে পারেনি কিন্তু সেই ব্যক্তি যেহেতু বুদ্ধিমান ছিলেন তাই তিনি দেখেছিলেন, একটি লাড্ডু প্রস্তুতের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে শ্রম দিতে হয়।

এটি তো জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি নসীহত করেছেন কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক জগতের বুযূর্গ বা নেক মানুষ তারাও এমনই করেছেন। এরপর তিনি (রা.) মির্যা মাযহার জানে-জানার ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বাটালার এক ব্যক্তি গোলাম নবীকে দু'টো লাড্ডু দেন। সে তা মুখে পুরে নেয় এবং খেয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ পর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি সেই লাড্ডুগুলো কী করেছ? সে বলল, খেয়ে ফেলেছি। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, কী? খেয়ে ফেলেছ? সে বলল, হ্যাঁ খেয়ে ফেলেছি। এভাবে তিনি বার বার তাকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন আর বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন, তুমি এত দ্রুত খেয়ে ফেলেছ। সে ভাবল, ইনি কীভাবে খান তাও দেখা উচিত। একদিন কেউ একজন তার কাছে কিছু লাড্ডু নিয়ে আসে। সেগুলো থেকে একটি নিয়ে তিনি রুমালে রাখেন আর সেখান থেকে একটি টুকরা নিয়ে তিনি এই বক্তৃতা আরম্ভ করেন, আমি এক অর্থহীন এবং অযোগ্য ব্যক্তি। আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এত বড় এক নিয়ামত পাঠিয়েছেন। এতে কী কী জিনিস রয়েছে আর কত লোক মিলে তা বানিয়ে থাকবে? আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির জন্যই কী আল্লাহ্ তা'লা এই নিয়ামত পাঠিয়েছেন? এভাবে তিনি বক্তৃতা অব্যাহত রাখেন এবং নিজের বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করতে থাকেন আর এভাবে খোদার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকেন। যোহর থেকে নিয়ে এই অবস্থার মাঝেই প্রথম যে দানা তিনি মুখে রেখেছিলেন শুধু তা-ই খেয়েছেন আর ইতোমধ্যে আসরের আযান হয়ে যায় আর তিনি তা ছেড়ে দিয়ে ওযু করার জন্য উঠে দাঁড়ান। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি কী ছিল? এটি এছাড়া আর কিছুই নয়, সেই লাড্ডুতে খোদা তা'লার সহস্র সহস্র নিদর্শন তার চোখে পড়ছিল। এমনিতে তো এক ব্যক্তি চার-পাঁচটি বা দশ-বিশটি লাড্ডুও স্বল্প সময়ে খেয়ে ফেলতে পারে কিন্তু মাযহার জানে-জানার জন্য একটি লাড্ডু খাওয়াই এত কঠিন ছিল, খোদার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করে তার কোমর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। কাজেই বিবেকই একটি তুচ্ছ বস্তুকে অনেক বড় করে তোলে আর অজ্ঞতা দৃশ্যত একটি বড় বস্তুকেও তুচ্ছ প্রতিভাত করে। অনুরূপভাবে বিবেক বাহ্যত একটি বড় বস্তুকেও ছোট করে দেখায় আর নির্বুদ্ধিতা এক সামান্য বস্তুকেও বড় করে তুলে ধরে। অতএব

বিবেকবান মানুষ ছোট-খাটো বিষয়েও খোদা তা'লার বড় বড় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে আর নির্বোধ বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কথাতেও কিছুই দেখতে পায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, আমার সত্যতার পক্ষে আল্লাহ্ তা'লা লক্ষ লক্ষ নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। এটি একেবারেই সত্য এবং সঠিক কথা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) সত্যতার পক্ষে এত বেশি নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, তা গুণেও শেষ করা যাবে না; কিন্তু এগুলো কাদের জন্য নিদর্শন? এই যে নিদর্শন দেখিয়েছেন সেটি কাদের জন্য? শুধু তাদেরই জন্য যাদের বিবেক-বুদ্ধি আছে। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর সত্যতার নিদর্শন দেখার জন্য এখানে আসে তাহলে এখানে অর্থাৎ, কাদিয়ানে যত ভবন বা অট্টালিকা রয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, এখানে মসজিদে আকসায় দাঁড়িয়ে যা চোখে পড়ছে এগুলোর কয়েকটি ছাড়া বাকি সবই তাঁর সত্যতার নিদর্শন। এছাড়া আহমদীয়া বাজারের সামনে যত বাড়িঘর নির্মিত রয়েছে সেগুলোর জন্য জমি প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে যে মাটি ফেলা হয়েছে তার এক একটি বস্তা ছিল নিদর্শন। এখানে এত বড় এক গর্ত ছিল যে, হাতিও এতে ডুবে যাওয়া সম্ভব ছিল। মাটি ফেলে তা ভরাট করা হয়েছে এবং এরপর আবাদ হয়েছে। এরপর কাদিয়ানের বাইরে উত্তর দিকে এগিয়ে যান। সেখানে যে উঁচু উঁচু অট্টালিকা দেখা যাবে সেগুলোর প্রতিটি ইট আর চুনের প্রতিটি কনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন। এছাড়া কাদিয়ানে বিরচণকারী যত মানুষ দেখা যায় তা সে হিন্দু হোক বা শিখ, অ-আহমদী হোক বা আহমদী তাদের সবাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন। আহমদীরা এজন্য নিদর্শন, কারণ তারা তাঁর সত্যতার নিদর্শন দেখে নিজেদের বাড়িঘর পরিত্যাগ করে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে। আর অ-আহমদী ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ যে কারণে তাঁর সত্যতার নিদর্শন তাহলো, তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি, পোষাক ইত্যাদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বে সেরূপ ছিল না যা এখন রয়েছে। তাদের পাগড়ী, তাদের জামা, তাদের পায়জামা, তাদের অট্টালিকা, তাদের ধন-সম্পদ তা ছিল না যা আজকে রয়েছে।

আজও কাদিয়ানের উন্নতি এ কথার সাক্ষী। মানুষ আজও কাদিয়ান গেলে এজন্যই যায়, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রাম। এ কারণে যায় না যে, এটি একটি শহর আর সাধারণ শহরের মতো এর জনবসতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উন্নতি করছে বা শহর বিস্তার লাভ করেছে। সেখানকার ব্যবসায়ীরা আজও এই আশায় বুক বাঁধে, এখানে জলসা হবে যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সূচীত আর এর মাধ্যমে আমাদের ব্যবসা উন্নতি করবে। কাজেই এই শহরের এরূপ উন্নতি এবং অ-আহমদীদেরও আর্থিক দিক থেকে যে উন্নতি হচ্ছে সেটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণেই হচ্ছে। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর মানুষ তাঁর কাছে আসে এবং তারাও লাভবান হয় এবং লা ইয়াশ্কা জালীসুহুম-এর কল্যাণে তারাও নিয়ামত লাভ করেছে। তাই এসবই তাঁর সত্যতার নিদর্শন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, এই মসজিদই অর্থাৎ যেখানে তিনি এই খুতবা দিচ্ছিলেন এই মসজিদের বিল্ডিং, এই কাঠ, এই স্তম্ভ এগুলো সবই নিদর্শন কেননা এগুলো পূর্বে ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবী করেছেন এরপর এগুলো নির্মিত হয়েছে। অতএব লক্ষ লক্ষ নিদর্শন তো এখানেই দেখা সম্ভব। এরপর বার্ষিক জলসায় যত মানুষ আসে; তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি নিদর্শন যা আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বছর প্রকাশ করেন। আর যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন তা প্রকাশ করতে থাকবেন। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিদর্শনের সংখ্যা অনুমান করতে গিয়ে খুব কমই বলেছেন, তা লক্ষ লক্ষ হবে। আমি বলব, এর সংখ্যা এত বেশি যে, কোন মানুষের পক্ষে তা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। শুধু খোদা তা'লাই তা ধারণা করতে পারেন। কিন্তু যেখানে এই নিদর্শনাবলী আমাদের জন্য ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয় সেখানে এই আয়াতের অধীনে একথাও বলে, প্রথমতঃ প্রত্যেক আগমনকারী ব্যক্তি চোখ খুলে দেখুক, এখানে কত নিদর্শনাবলী রয়েছে। এছাড়া সে নিজেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি নিদর্শন। আর আজ পৃথিবীতে বিস্তৃত জামাতে আহমদীয়ার মসজিদ, মিশন হাউস, জামেয়া, স্কুল, হাসপাতাল, স্থানীয় লোকদের তাঁর (আ.) প্রতি ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ সবই নিদর্শন। যার আধ্যাত্মিক চোখ আছে কেবল তার পক্ষেই এগুলো দেখা সম্ভব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার ভালভাবে মনে আছে, একজন মৌলভী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসে এবং বলে, আমি আপনার কোন নিদর্শন দেখতে এসেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হেসে উঠেন এবং বলেন, মিঞাঁ! তুমি আমার বই হাকীকাতুল ওহী পড়ে দেখ। তুমি জানতে পারবে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সমর্থনে কত নিদর্শন দেখিয়েছেন। তুমি সেগুলো থেকে কতটা লাভবান হয়েছ, আরো নিদর্শন দেখতে এসেছ?

অতএব যদি সেই ব্যক্তি দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিটে পরিপূর্ণতা লাভকারী দু'চারটি ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করত তাহলে আমরা তার কেবল দু'বছরই নয় বরং দু'শ বছরে পরিপূর্ণতা লাভকারী ভবিষ্যদ্বাণীতেও বিশ্বাস স্থাপন করতাম। আর বলতাম, যেহেতু আমরা দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিটে পরিপূর্ণতা লাভকারী ভবিষ্যদ্বাণী দেখেছি তাই এই দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণীও অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের স্বল্প মেয়াদী ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা না দেখিয়েই দীর্ঘ মেয়াদী ভবিষ্যাদ্বাণী করে তাহলে আমরা বলব, এটি বিবেক বহির্ভূত কথা। অপরদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবদ্দশায়ও পূর্ণ হয়েছে আর আজও পূর্ণ হচ্ছে। আমি যেমনটি বলেছি, জামাতের নিত্য দিনের উন্নতিই এর প্রমাণ।

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে পূর্ণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা এর কল্যাণে যারা দেখতে পায় না তাদেরকেও দৃষ্টি শক্তি দিন যেন তারা তা দেখতে পায়। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও প্রতিক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্ত ঈমানে উত্তরোত্তর দৃঢ়তা দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।